আসামের অর্থনীতি, দারিদ্র্য এবং 'বিদেশি খেদাও' আন্দোলনের রাজনীতি

আলতাফ পারভেজ

আসামে প্রায় ৪০ লাখ মানুষ এখন ভয়াবহ অনিশ্চয়তার মধ্যে বাস করছেন। 'বাংলাদেশি মুসলিম অবৈধ অভিবাসী' ইস্যু ধরে বাংলাদেশের জন্য বিপজ্জনক প্রচারণা বিজেপির হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির এখন এক বড় অস্ত্র। এক বিশাল মুসলিম জনসংখ্যাকে বাংলাদেশে ঠেলে দেবার সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা গ্রাস করেছে আসামের রাজনীতি। তাতে ঢাকা পড়ছে আসামের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের দারিদ্র, বঞ্চনা ও আঞ্চলিক বৈষম্যের জরুরি দিকগুলো। এই লেখায় আসামের সম্পদ ও দারিদ্রের চিত্র এবং পাশাপাশি বিদ্বেষী রাজনীতির শক্তিবৃদ্ধি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্যাপক ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং ভূ-সম্পদ থাকলেও আসামে অর্থনীতি নিয়ে তথ্য-উপাত্ত-বিশ্লেষণের আধুনিক ইতিহাস অতি নবীন। আসামে যাঁকে স্থানীয় অর্থনীতিচর্চার প্রবাদপুরুষ হিসেবে মান্য করা হয়, সেই ভবানন্দ দেকার এ সংক্রান্ত বহুল আলোচিত গ্রন্থটি (*অসম'র অর্থনীতি*) প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৩ সালে। এ বইটি অসমিয়া জাতীয়তাবাদের অন্যতম উৎসাহদাতা প্রকাশনা। যার ফলস্বরূপ এই গ্রন্থটির ইতোমধ্যে প্রায় অর্ধশত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ অসমিয়ারা নিজ অর্থনীতির তথ্য-উপাত্ত নিয়ে অতি বিলম্বে হলেও এখন আগ্রহী। তবে সেই আগ্রহ ধামাচাপা দিয়েছে অভিবাসনের রাজনীতি। কারণ আসামের অর্থনৈতিক চিত্রটি সমস্যাপূর্ণ এবং অনেকের জন্য বিব্রতকর। তাই অর্থনীতির বাস্তবতা আড়াল করতে সেখানে এসেছে 'বিদেশি খেদাও'-এর রাজনীতি।

ভারতে ২৯টি রাজ্য এবং ৭টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল রয়েছে। তার মধ্যে আয়তন ও জনসংখ্যার সঙ্গে জিডিপির তুলনা করলে সর্বভারতীয় পটভূমিতে আসামের অবস্থানটি বোঝা যায়। ভারতের জনসংখ্যায় আসামের হিস্যা (২০১১-এর হিসাবে) ২.৫৮ শতাংশ। আয়তনে হিস্যা ২.৩৯ শতাংশ। কিন্তু জিডিপিতে হিস্যা মাত্র ১.৭০ শতাংশ। আয়তন ও জনসংখ্যার সাথে জিডিপির হিস্যাগত এই তুলনায় আসামের অবস্থান ভারতে ১৯তম।[১] এই চিত্রের সবচেয়ে উদ্বেগজনক দিক হল, ১৯৫০-৫১ অর্থবছরে মাথাপিছু আয়ে আসাম ভারতীয় গড়ের চেয়ে ৪ শতাংশ ওপরে ছিল। ৭০ বছর পরের দৃশটি হল, ভারতে যখন মাথাপিছু আয়ের গড় ১ লাখ ৩ হাজার ৮৭০ রুপি, আসামে তা ৬৭ হাজার ৬২০ রুপি।[২]

বৃহত্তর ভারতীয় পটভূমিতে প্রান্তিক আসামের পিছিয়ে পড়ার একটা বড় কারণ নিহিত রয়েছে খোদ ভারতের সংবিধানেই। বিশেষত কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের মাঝে। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার যখন যে ধরনের অর্থনৈতিক পথ বেছে নিয়েছে আসামের মত প্রান্তিক অঞ্চলকে শুধু তা অনুসরণ করতে হয়েছে মাত্র।[৩] সেটা একককালের 'মিশ্র অর্থনীতি' হোক আর আজকের পূর্ণ পুঁজিতান্ত্রিক পথই হোক। এ ক্ষেত্রে আসাম কখনওই বিশেষ সহানুভূতিশীল কোন মনোভাবের আশ্রয় পায়নি কেন্দ্রের তরফ থেকে। কখনওই নিজের জন্য কোন অর্থনৈতিক সার্বভৌমত্বও পায়নি সে। যদিও তার প্রয়োজন ছিল।

ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম শিডিউলের 'তালিকা-১'-এ বিবরণ রয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের করারোপ ক্ষমতা সম্পর্কে। আর 'তালিকা-২'-এ রয়েছে রাজ্য সরকারের করারোপ ক্ষমতা নিয়ে। কোথাও কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের যৌথ করারোপের কোন সুযোগ নেই। রাজ্য সরকারগুলোর হাতে করের উৎস সীমিত। যেমন–কৃষি আয় ও কৃষিজ ভূ-সম্পদের ওপর কর, মদজাতীয় পানীয়ের ওপর আবগারি শুল্ক, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের জিনিসের ওপর বিক্রয় কর, যানবাহনের ওপর কর ইত্যাদি স্বল্প আয়ের ক্ষেত্রগুলো ব্যতীত আয়কর থেকে কর্পোরেট কর পর্যন্ত করের প্রধান উৎসগুলো রয়েছে কেন্দ্রের হাতেই। এসব আয় থেকে যদিও 'কেন্দ্র' সরকার রাজ্যগুলোতে নানাভাবে বরাদ্দ দেয়, কিন্তু কর-প্রক্রিয়াটির আইনগত ভিত্তি ব্রিটিশ শাসনামলের 'গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট-১৯৩৫'-এর মতই রয়েছে।

ভারতকে 'ফেডারেল রাষ্ট্র' বলা হয় বটে, কিন্তু করারোপ এবং সেই সম্পদ থেকে রাজ্যপ্রতি বরাদ্দ এবং এ সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণী প্রক্রিয়ার ধরনে রয়েছে অতিকেন্দ্রীভূত বৈশিষ্ট্যের ছাপ।[৪] কেন্দ্রের হাতে যখন করের প্রধান উৎসগুলো রেখে দেয়া হয়েছে তখন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পানি ও স্যানিটেশনের মত বিষয়গুলোর দায়িত্ব বর্তেছে রাজ্য সরকারের ওপর। এইরূপ পরিস্থিতিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করেই 'উলফা'র মত রাজনৈতিক শক্তিগুলো অসমিয়া তরুণদের তাদের কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তাতে পরিস্থিতির কোন হেরফের হয়নি।

ভারতের জাতীয় হারের চেয়ে আসামে বেকারত্বের হার তিন গুণ বেশি

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ভারত কেন্দ্র থেকে রাজ্যমুখী সম্পদের স্থানান্তরের যেসব কাঠামো ও পদ্ধতি অনুসরণ করছে তার মধ্যে ছিল কেন্দ্রীয় ফিন্যান্স কমিশন (ইউএফসি), প্ল্যানিং কমিশন (পিসি) এবং 'দুর্যোগ পুনর্বাসনকালীন বরাদ্দ'। ফিন্যান্স কমিশন গঠন করেন ভারতের রাষ্ট্রপতি। বলা বাহুল্য, বিষয়টি শেষ বিচারে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক সরকারেরই এখতিয়ারের বিষয়। আর প্ল্যানিং কমিশনের চেয়ারম্যান খোদ রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী।[৫]

স্বাধীনতার পর ভারতে বস্তুত কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক আরও কেন্দ্রীভূতই হয়েছে। প্রথম দুই দশক (১৯৪৭-৬৬) নেহরুর শক্তিশালী কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের শাসনকালে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল কংগ্রেসের 'কেন্দ্রীয় কমিটি'র সঙ্গে 'রাজ্য কমিটি'র সম্পর্ক মাত্র। সেই ধারাবাহিকতায় আধুনিক ভারতে আসামের মত রাজ্যগুলোর মানুষের ভাগ্য কার্যত 'কেন্দ্র'র ওপরই নির্ভরশীল হয়ে আছে। ইউএফসি এবং পিসির নীতিমালায় বিভিন্ন সময় রাজ্যবান্ধব পরিবর্তন এলেও সেটা কেন্দ্রীভূত ছিল এরূপ মনোযোগের ওপর যে, রাজ্যগুলো বরাদ্দ পাবে হয় জনসংখ্যার ভিত্তিতে, না হয় আয়তন বা প্রান্তিকতার ভিত্তিতে। রাজ্যগুলোকে তাদের সম্পদ নিয়ন্ত্রণের অধিকার দেয়া নিয়ে কোন কাঠামোগত সংস্কার হয়নি সেখানে।

বর্তমানে রাজ্যগুলো কেন্দ্রের আয়ে গড়ে ৩০ শতাংশ হিস্যা পায়। এটা আরও বৃদ্ধি নিয়ে বিতর্ক হয় বটে, কিন্তু কখনওই নিজস্ব সম্পদের ওপর রাজ্যগুলোর স্বায়ত্তশাসন প্রশ্ন সেখানে প্রধান ভাবনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়নি। রাজ্যগুলোর 'সম্পদ' কোথায় যাচ্ছে এবং

'কেন্দ্র' থেকে তারা কী পাচ্ছে তা নিয়ে রাজ্য পর্যায়ে মুষ্টিমেয় হলেও সচেতন মানুষদের মাঝে বরাবরই ক্ষোভ ছিল এবং আছে। বিশেষ করে সেইসব রাজ্যে, যারা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলের আগে স্বাধীন ছিল এবং বর্তমানে অতিমাত্রায় দরিদ্র। আসাম সে রকম এক জনপদ।

উপরোক্ত পটভূমিতেই আসামজুড়ে একদা জাতীয়তাবাদী তরুণদের মাঝে একটা জনপ্রিয় রাজনৈতিক স্লোগান ছিল, 'তেজ দিম, তেল নি দিয়ু'। অর্থাৎ 'রক্ত দেব, কিন্তু তেল দেব না'। এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে এটা স্পষ্ট যে, অসমিয়া জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান তাদের খনিজ সম্পদের ন্যায্য হিস্যা না পাওয়ার বেদনা। বস্তুত এই সোগান আসাম ও নয়াদিল্লির সম্পর্ককে এক অগ্নিপরীক্ষায় ফেলে দিয়েছিল। একইভাবে এই স্লোগানে মূর্ত হয়ে আছে আসামের সম্পদের ওপর স্থানীয়দের অধিকারহীনতার দীর্ঘ ঔপনিবেশিক ইতিহাস।

আসামে যখন চা শিল্পের বিকাশ ঘটে তখনও তাতে স্থানীয়দের কোন রাজস্ব হিস্যা ছিল না। এমনকি বিক্রয় করও পেত পশ্চিমবঙ্গ; কারণ চায়ের নিলাম হত কলকাতায়। আসামের অর্থনীতির প্রধান তিনটি ক্ষেত্রের (অপরটি কৃষি) দুটিতেই এভাবে ছিল অসমিয়াদের জন্য অসন্তোষের কারণ।[৬]

স্বাভাবিকভাবে আসামের অর্থনীতির এইরূপ ঔপনিবেশিক জের অসমিয়াদের ১৯৪৮-এর পরও অসন্তুষ্ট রেখেছিল। এই অসন্তোষের আরেকটি সম্পূরক কারণ হলো–স্থানীয় অর্থনীতির মাঝে বৈচিত্র্য তৈরি না হওয়া এবং কৃষির ওপর অতিরিক্ত মাত্রায় প্রকৃতিনির্ভরতা থেকে সৃষ্ট ধীরগতির বিকাশ। অসমিয়া তরুণরা বৃহত্তর ভারতীয় পরিসরে নিজেদের কেবল পিছিয়ে পড়তেই দেখেছে।

প্রাকৃতিকভাবে ভারতের অন্যতম সম্পদশালী প্রদেশ হয়েও ২০১৮-১৯-এ এই রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থান দাঁড়িয়েছে ভারতে ১৯তম।[৭] ২০১৪-১৫ সালের এক হিসাবে দেখা যায়, আসামে কেন্দ্র থেকে মাথাপিছু অর্থ স্থানান্তর গড়ে ৮ হাজার ৫৪ রুপি। জাতীয় পর্যায়ে এই গড় ৫ হাজার ৩৯৯ রুপি। আবার আসামে মাথাপিছু রাজস্ব আদায় ৩ হাজার ৬৩০ রুপি। কিন্তু সর্বভারতীয় গড় সেটা ৭ হাজার ৪১৯ রুপি।[৮] উপর্যুক্ত চিত্র থেকে দেখা যায়, আসামের হাতে সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ কম। একই সঙ্গে তাকে কেন্দ্রের অর্থ সহায়তার ওপর নির্ভর করে রাখা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভারতের রাজ্যগুলোর সঙ্গে আসামের মানুষের আয়গত ভিন্নতা বিশেষভাবে ফুটে ওঠে– যখন দেখা যায় হরিয়ানার মত রাজ্যে মাথাপিছু বার্ষিক আয় ১ লাখ ৬৫ হাজার ৭২৮ রুপি–সেখানে আসামে তা ৬০ হাজার ৬২১ রুপি।[৯]

আসামের অর্থনীতির পিছিয়ে পড়া চরিত্রের সঙ্গে রাজ্যটির রাজনীতি ও রাজনৈতিক প্রশাসনের দুর্নীতির রয়েছে গভীর যোগ। লোকসভায় মাত্র ১৪ জন সদস্য থাকায় আসাম ভারতের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া প্রভাবিত করতে পারে সামান্যই। ভারতের মধ্যে আসামের এই বিধিবদ্ধ সীমাবদ্ধতা রাজনীতির মঞ্চে অনেক সময়ই আড়াল করে রাখা হয়েছে সচেতনভাবে। তার বদলে যথারীতি প্রধান প্রসঙ্গ করে রাখা হয়েছে জাতিগত বিবাদ এবং 'অবৈধ অভিবাসন' ইস্যুকে। বলা হয়েছে, অবৈধ বিদেশিরাই আসামের অর্থনীতির ওপর অস্বাভাবিক চাপ তৈরি করে রেখেছে। আসামের পদ্ধতিগতভাবে অর্থনৈতিক পিছিয়ে পড়ার চেয়ে জরুরি হল 'অবৈধ অভিবাসীরা'। বলা বাহুল্য, যারা অধিকাংশই দরিদ্র কৃষিজীবী মাত্র এবং যার বড় অংশই মুসলমান। এইরূপ জনগোষ্ঠীকে 'শত্রু' হিসেবে সাব্যস্ত করা বৈশ্বিক 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ'র সঙ্গেও বেশ মানানসই ছিল।

'অবৈধ অভিবাসন' বিরোধী প্রচারণার মাধ্যমে আসামে তরুণদের সামনে থেকে রাজনীতির মোড় ঘোরানো গিয়েছিল। জনগণের প্রায় ৭৫ শতাংশ জীবনযাত্রায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষিসংশ্লিষ্ট হলেও আসামের অবিকশিত এই খাত থেকে নবীন প্রজন্মের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছিল না। রাজ্যের জিডিপিতে কৃষি মাত্র ২০ শতাংশ অবদান রাখতে পারছে। আবার সরকার বিকল্প খাত সৃষ্টি করে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরিতেও ছিল অসমর্থ। নর্থ ইস্টার্ন ডেভেলপমেন্ট ফিন্যান্স কর্পোরেশন লিমিটেডের এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাজ্যটিতে বছরে প্রায় পৌনে দুই লাখ মানুষের জন্য কাজের সুযোগ তৈরি করা দরকার। কিন্তু বাস্তবতা তার চেয়ে পিছিয়ে। ভারতের জাতীয় হারের চেয়ে আসামে বেকারত্বের হার তিন গুণ বেশি।[১০] এ রকম তরুণদের সামনে অনিশ্চিত অর্থনৈতিক ভবিষ্যতের একটা কারণ হাজির করা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং আসামের রাজ্য সরকারের জন্য জরুরি ছিল। 'বিদেশি' প্রসঙ্গের মাধ্যমে সেটাই সৃষ্টি করা গিয়েছিল।

> এইরূপ সম্মিলিত শক্তি হিন্দুত্ববাদের ব্যানারে ক্ষমতায় এসেই রাজনৈতিক বন্দুকটির মুখ 'সম্পদের হিস্যা'র বদলে দরিদ্র মুসলমানদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ছাত্রজীবনে তারা আসাম থেকে বিদেশি খেদাও আন্দোলন করে বড় হলেও ক্ষমতায় আসার পরই দেখা গেল (২০১৬ সালে) আসামের ১২টি তেলক্ষেত্র 'বিদেশি' বিনিয়োগকারীদের দিতে মন্ত্রী-এমপিরা আর কুণ্ঠিত নন।

লক্ষ করলে দেখা যাবে, বাংলাদেশ সীমান্তে ভারত 'অবৈধ অভিবাসন' নিয়ে উচ্চকিত হলেও নেপাল সীমান্তে তাদের অবস্থান তদ্রূপ নয়। বরং বলা যায়, নেপাল সীমান্তটি প্রায় উন্মুক্ত। বাংলাদেশ-আসাম সীমান্তের দৈর্ঘ্য যেখানে ২৬২ কিলোমিটার মাত্র, নেপাল-ভারত সীমান্ত দৈর্ঘ্য সেখানে প্রায় সাত গুণ বড়–১৭৫৮ কিলোমিটার লম্বা। এই সীমান্ত পেরিয়ে এসে প্রচুর নেপালি ভারতে অবস্থানও করছে। কিন্তু তাদের 'বিদেশি খেদাও'ধর্মী কোন আন্দোলনের শিকার হতে হচ্ছে না। এই সীমান্ত দিয়ে প্রতিদিন পাসপোর্ট-ভিসা ছাড়াই হাজার হাজার মানুষ চলাচল করছে। সেটা সন্নিহিত ভারতীয় রাজ্যগুলোতে কোন আপত্তিরও জন্ম দিচ্ছে না। কিন্তু আসামের মিডিয়া প্রায় প্রতিদিন তথাকথিত বাংলাদেশিবিরোধী প্রচারণায় আকীর্ণ গত কয়েক দশক ধরে।

বস্তুত বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বরাবরই অভিবাসন এবং অভিবাসীদের সস্তা শ্রমকে একটা সহায়ক উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে অভিবাসন কোন দেশের অর্থনীতিতে অভিশাপ না আশীর্বাদ সে বিতর্ককে আসামের ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিকই মনে হয়–কারণ এখানে খোদ এই প্রশ্নই তোলা যায় যে, আসামের অর্থনৈতিক বাস্তবতা সেখানে আদৌ ব্যাপকভিত্তিক অভিবাসনের ধারণাকে সমর্থন করে কি না?

এ লেখায় এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। তবে তার পূর্বে আমাদের আসামের অর্থনীতি ভালভাবে বোঝা দরকার। এ ক্ষেত্রে প্রতীকীভাবে আসামের প্রধান দুটি অর্থনৈতিক খাতকে সামনে রেখে আমরা এই রাজ্যের অর্থনীতি সম্পর্কে কিছু চুম্বক ধারণা পেতে পারি।

আসামের খনিজ তেলের ভান্ডার তার দারিদ্র্য ঘোচাতে পারেনি

আসামের তেলশিল্পের শুরু এই রাজ্যের ডিগবয় থেকে। কথিত আছে, ওখানে হাতির পায়ে তেল লেগে আছে দেখে তার চলার পথ অনুসরণ করে ব্রিটিশ প্রকৌশলী ডাব্লিউ এল লেক বলে উঠেছিলেন, 'ডিগ, বয় ডিগ' (খনন করো, খনন করো)। তিনি সেখানে তখন আসামে রেলপথ বসানোর কাজে যুক্ত ছিলেন। সেই থেকে ওই জায়গার নামই হয়ে গেছে 'ডিগবয়'। আদতে এটা আসামের বার্মাসংলগ্ন তিনসুকিয়া জেলার একটা জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা ছিল। তিনসুকিয়ার ওই হাতির সূত্রেই জন্ম আসামের তেল খাতের।

অয়েল ইন্ডিয়া (ওআইএল) আসাম থেকে প্রতিবছর ৩.২ মিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেল উৎপাদন করে। রাষ্ট্রীয় আরেকটি প্রতিষ্ঠান উৎপাদন করে বছরে ১.১ মিলিয়ন টন। ভারতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আসামের তেল খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে– যদিও পুরো চাহিদার তুলনায় তার হিস্যা সামান্য। আসামে ১.৩ বিলিয়ন থেকে ১.৭ বিলিয়ন টন অপরিশোধিত তেলের মজুদ রয়েছে বলে অনুমিত হয়। গ্যাসের মজুদ প্রায় ১৫৬ বিলিয়ন কিউবিক মিটার।[১১] অসমিয়রা চায় তাদের হাইড্রোকার্বন আসাম সরকারই উত্তোলন করুক। সেই লক্ষ্যে ২০০৬ সালে 'আসাম হাইড্রোকার্বন কর্পোরেশন লিমিটেড' (এএইচসিসিএল) গঠিত হয়। কিন্তু তেল উত্তোলনের সামর্থ্য বাড়ানোর কাজে কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তা পাওয়া যায়নি। কেন্দ্র এখন যা চাইছে তা হল আসামের তেলশিল্পের বেসরকারীকরণ। ভারতের রাজনীতিতে বিজেপিকে মদদ দেয়ার ক্ষেত্রে এটাই ছিল ভারতের বড় বড় কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের মূল প্রণোদনা। কারণ বিজেপি আসামের তেলশিল্পে কর্পোরেটদের যুক্ত করতে খুবই আগ্রহী।

দ্য টেলিগ্রাফের ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিলের এক সংবাদে দেখা যায়, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও আসামে প্রায় ৩২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে। আসাম থেকে দৈনিক ৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসও উত্তোলিত হয়–যার সামান্যই আসামে ব্যবহৃত হয়।

লুণ্ঠনের ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য এবং জাতীয়তাবাদের প্রতারণা

ব্রিটিশ শাসনামলেই ১৮৮৯-এ আসামে তেলের সন্ধান মেলে। পেনসিলভানিয়ায় প্রথম তেলকূপ খননের সাত বছরের মধ্যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এই তরল সোনার খোঁজ বের করে। তখন এর সুবিধা ভোগ করেছে ব্রিটিশ মালিকানাধীন 'বার্মা অয়েল কোম্পানি' (তাদেরই অঙ্গপ্রতিষ্ঠান 'আসাম অয়েল কোম্পানি')। ১৮৯৯ থেকে এই তেল কোম্পানি আসামে ব্যবসায় যুক্ত। ব্রিটিশ-ভারতের আসামেই প্রথম ঔপনিবেশিক শক্তি এইরূপ আকর্ষণীয় খাত খুঁজে পায় এবং নির্বিঘ্নেই পুরো শাসনকালে এ খাত থেকে আয় করে। আসামের তেল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পুঁজিতন্ত্রের জন্য ছিল একধাপ অগ্রগতি। কয়লা থেকে তার উত্তরণের রাস্তা দেখায় খনিজ তেল। সেই 'আসাম অয়েল'ই আজকের 'অয়েল ইন্ডিয়া লিমিটেড'। আসাম অয়েল ছাড়াও ঔপনিবেশিক শক্তি জ্বালানি ব্যবসার জন্য ১৯২৮-এ প্রতিষ্ঠা করেছিল বার্মা-শেল অয়েল স্টোরেজ ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি। তারই জের আজকের 'ভারত পেট্রোলিয়াম'। অর্থাৎ আসামে ব্রিটিশদের যে আয়-রোজগারের শুরু–১৯৪৭-এর 'স্বাধীনতা'র পর তার মালিকানা গেছে নয়াদিল্লির হাতে–গৌহাটিতে নয়। একটু পরের আলোচনায়ই আমরা দেখব ১৯৪৭-পরবর্তী চা শিল্পের স্থানান্তরও ঘটেছিল একই চরিত্র নিয়ে।

তেল উত্তোলন থেকে আসাম কতটা হিস্যা পাবে, কীভাবে পাবে–এ নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে স্থানীয় সরকারের বিবাদ শুরু ১৯৪৭-এর পর থেকে। দীর্ঘ এই বিবাদে ২০০৮ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত আসামকে রয়ালটি দেয়াও বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন থাকাবস্থায় ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কেন্দ্রীয় সরকার হঠাৎ এক ঘোষণায় ২০০৮ থেকে পরবর্তী ছয় বছরের বকেয়া হিসেবে আসাম সরকারকে ৬৩২০ কোটি রুপি দেয়ার ঘোষণা দেয়। একই সময়ে আসামের ১২টি তেলক্ষেত্র বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়ারও ঘোষণা দেয়া হয়, যা থেকে ১৭ হাজার কোটি রুপি আয় হবে বলে সরকার জানিয়েছে। যেহেতু ভারতের কেন্দ্রে ২০১৪ থেকে এবং আসামে ২০১৬ থেকে বিজেপিই ক্ষমতায় রয়েছে, সে কারণে কেন্দ্রীয় সরকারের তেলক্ষেত্র বেসরকারীকরণের সিদ্ধান্তে সায় রয়েছে স্থানীয় সরকারেরও। কারণ উভয়ই একই দলের সরকার। অথচ আসামের বিজেপি সরকারে এমন অন্তত ১৮ জন নেতা রয়েছেন, যাঁরা অতীতে অল আসাম স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (আসু)-এর 'তেজ দিম, তেল নি দিয়ু' রাজনীতির মধ্য দিয়েই নেতা হয়ে উঠেছিলেন। আসুর কর্মী দুলাল শর্মাই বেড দিয়ে বুক চিরে সেই রক্ত দিয়ে গৌহাটির রাজপথে লিখেছিল–'তেজ দিম, তেল নি দিয়ু'। এরাই পরিণত বয়সে বিজেপির সংগঠক ভিত্তি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ আসামে বিজেপির বিকাশই হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে যারা এই রাজ্যে তেলসম্পদ জাতীয়করণের আন্দোলন করেছে তাদের দ্বারা।

আসামের রাজনীতিতে উপরোক্ত স্ববিরোধিতার এখানেই শেষ নয়। আসামে সংগঠন বিকাশের দীর্ঘ সময়ই বিজেপির মূল স্লোগান ছিল, তারা 'জাতি-মাটি-বেটি' রক্ষা করবে। 'জাতি', 'মাটি', 'বেটি' বলতে তারা বোঝাত অসমিয়া জনগোষ্ঠী, তাদের ভূ-সম্পদ এবং রাজ্যের খনিজ সম্পদকে। এইরূপ 'জাতীয়তাবাদী' বিজেপি আসামে ক্ষমতায় এসেছে আবার অসমিয়া জাতীয়তাবাদের আরেক চ্যাম্পিয়ন শক্তি 'অসম গণপরিষদ'কে সঙ্গে নিয়ে এবং বোড়োদের সমর্থন নিয়ে।

এইরূপ সম্মিলিত শক্তি হিন্দুত্ববাদের ব্যানারে ক্ষমতায় এসেই রাজনৈতিক বন্দুকটির মুখ 'সম্পদের হিস্যা'র বদলে দরিদ্র মুসলমানদের দিকে ঘুরিয়ে দেয়। ছাত্রজীবনে তারা আসাম থেকে বিদেশি খেদাও আন্দোলন করে বড় হলেও ক্ষমতায় আসার পরই দেখা গেল (২০১৬ সালে) আসামের ১২টি তেলক্ষেত্র 'বিদেশি' বিনিয়োগকারীদের দিতে মন্ত্রী-এমপিরা আর কুণ্ঠিত নন। অর্থাৎ ক্ষমতায় আসা মাত্রই তরুণ জাতীয়তাবাদী অসমিয়া নেতৃত্ব তেলসম্পদে ভারতের কর্পোরেটদের অংশীদারত্ব দেয়ার কাজ শুরু করে দ্রুতলয়ে। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটি আড়াল করা হয় 'অবৈধ অভিবাসন' বিরোধী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। ফলে আসামে তেলসম্পদে ন্যায্য হিস্যার বিষয়টি অতীতের মতই আজও অনেকখানি অধরাই রয়ে গেছে। নতুন করে এ ক্ষেত্রে যা ঘটেছে তা হল, ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে কর্পোরেটদের স্বার্থের মিলন।

উল্লেখ্য, ভারতের তেলক্ষেত্র উন্নয়ন আইন (Oil Fields Regulations and Development Act-ORDA 1948) অনুযায়ী রাজ্য এগুলোর মালিক হলেও কেন্দ্র তা 'পরিচালনা' করতে পারে।

এত দিন এসব তেলক্ষেত্র থেকে তেল উত্তোলনকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে 'অপারেটরশিপ'-এর জন্য রাজ্য সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নিতে হত এবং তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ রয়ালটি দিতে হত।[১২] কিন্তু তেলক্ষেত্রগুলো বেসরকারীকরণের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের এরূপ রয়ালটি পাওয়ার অধিকার রাখা হয়নি। উপরন্তু বেসরকারি কোম্পানিগুলো তেলের পরিশোধন ও বিক্রির বিষয়েও স্বাধীন থাকবে। যেহেতু আসামে তেলশিল্প নিয়ে যে কোন সময় আবারও জাতীয়তাবাদী আবেগ জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, সে কারণে সরকার বলছে তারা তেলক্ষেত্র বেসরকারীকরণ করছে না–কেবল 'উৎপাদন অংশীদারত্বভিত্তিক চুক্তি' হবে বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে, কার্যত যা বেসরকারীকরণেরই একটা ভিন্ন নাম মাত্র।

আসামের তেল আসামের পরিবর্তে ১৪০০ কিলোমিটার দূরে বিহারের বারায়ুনিতে পাইপলাইনে করে নিয়ে পরিশোধন করা একদা অসমিয়াদের তরফ থেকে পুনঃপুনঃ আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল (১৯৫৬ ও ১৯৬৯ সালে) এবং তার ফলে আসামে দুটি রিফাইনারিও স্থাপিত হয়। কিন্তু অপরিশোধিত তেলের অভাবে উক্ত রিফাইনারি দুটি বন্ধের উপক্রম। আসামের তেলশিল্পের উপরোক্ত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, নিজস্ব খনিজ সম্পদের ওপর যেমন এখানে স্থানীয় জনগণের অধিকার রয়েছে সামান্যই, তেমনি এইরূপ সম্পদ উত্তোলন ও বিক্রয়ের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি ও প্রযুক্তিরও সেখানে বিকাশ ঘটানো হয়নি। যার পরোক্ষ ফল হিসেবে দ্য টেলিগ্রাফের ২০১৭ সালের ১০ এপ্রিলের এক সংবাদে দেখা যায়, খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়েও আসামে প্রায় ৩২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করছে।[১৩] আসাম থেকে দৈনিক ৫ কোটি ঘনফুট গ্যাসও উত্তোলিত হয়–যার সামান্যই আসামে ব্যবহৃত হয়।

আসামের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একাংশ হলো মুসলমানরা এবং আরেকাংশ হলো চা বাগানের শ্রমিক। মুসলমানদের সঙ্গে সরাসরি কর্পোরেট স্বার্থ জড়িত নয় বলে তারা সহজে 'টার্গেট' হলেও চা শ্রমিকরা হয়নি। সেটাও কর্পোরেট স্বার্থে। কারণ চা শিল্পের বড় অংশের মালিকানাও কেন্দ্রীয় ভারতের কর্পোরেটশক্তির হাতে। এ পর্যায়ে চা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে কিছু আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক হবে।

আসামের 'আদিম ভোটব্যাংক' : চা শিল্প

খনিজ তেলের পাশাপাশি আসামের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক খাত চা। বিশ্বের চা শিল্পের বড় এক হিস্যা আসামের। ভারতের চা উৎপাদনের ৫৫ শতাংশ হয় আসামে। বর্তমানে বছরে গড়ে প্রায় ৫০-৬০ কোটি কেজি চা উৎপাদিত হয় এখানে। প্রায় ৮০০ বড় এবং আরও বহু ছোট ছোট বাগান রয়েছে। প্রতিদিন গড়ে যে পরিমাণ চা শ্রমিক কাজ করে তা দৈনিক কাজ করা রাজ্য জনসংখ্যার অর্ধেক। চা শ্রমিকদের অবস্থা দিয়ে তাই আসামের নিম্নবর্গের জীবনচিত্রের অনেকখানি বোঝা সম্ভব।

চায়ের আবাদ রয়েছে প্রায় ২ দশমিক ৭ লাখ হেক্টর জমিতে। এসব জমি আসাম সরকার বাগান মালিকদের লিজ দিয়ে থাকে।[১৪] বাংলাদেশের মতই বৈশিষ্ট্য তার। এসব বাগানের শ্রমিক জনগোষ্ঠী প্রায় অর্ধকোটি, যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ সরাসরি শ্রমিক। সাধারণ্যে এসব জনগোষ্ঠীর মানুষ 'কুলি' নামেই উল্লিখিত হয়। ঔপনিবেশিক আমল থেকে 'স্বাধীনতা' শ্রমিকদের এই পরিচয় পাল্টাতে পারেনি।

অবহেলা ভরে 'কুলি' নামে উচ্চারিত এই শ্রমিক জনগোষ্ঠী আসামের জনসংখ্যার প্রায় ১৫-১৬ শতাংশ। এরা মূলত ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আনীত মুন্ডা, সানতাল, কুরুক ইত্যাদি ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। আপার আসামের গোলাঘাট, জোরহাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, লক্ষ্মীপুর ও দেমাজিতে বাগানগুলো অবস্থিত। শোনিতপুর ও কাছাড়েও কিছু চা শ্রমিক পরিবার আছে। এই চা শ্রমিকদের মাঝে ছোট-বড় ৯০টি নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও অসমিয়া রাজনীতির বিদেশি খেদাও আন্দোলন মূলত বাংলাভাষী মুসলামনদের টার্গেট করে থাকে–কিন্তু ব্রিটিশ শাসনামলে বিপুল হারে যে শ্রমিকদের আসামে আনা হয়েছে বাগিচায় কাজ করার জন্য, সেটা উল্লেখ করা হয় সামান্যই। মূলত বাগান মালিকদের স্বার্থেই আসামে অভিবাসনের এই দিকটি নিয়ে উচ্চবাচ্য করা হয় না। অথচ আসামে কথিত 'অস্বাভাবিক হারে' জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটাই ছিল অন্যতম কারণ।

নিচের সারণি থেকে আমরা আসামে চা শিল্পের প্রাথমিক দিনগুলোতে অভিবাসনের একটা ধরন আঁচ করতে পারি। যদিও এই সারণিটি সিলেটের সঙ্গে বিচ্ছেদ-পূর্ববর্তী সময়ের–তার পরও অভিবাসনের বিপুলতা বোঝা যায় এ থেকে।

ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা ভ্যালিতে ব্রিটিশ শাসনামলে ২৫ বছরে (১৮৭৬-১৯০১) বাগিচা শ্রমিকদের অভিবাসন চিত্র[১৫] (হাজারে)

বছর	বছরে গড় অভিবাসন
১৮৭৬-১৮৮০	২৯,৯৭৩
১৮৮১-১৮৮৫	২৯,৩৪৪
১৮৮৬-১৮৯০	৪১,০৭৭
১৮৯১-১৮৯৫	৫৫,২০০
১৮৯৬-১৯০০	৬৩,৯৯১

চা শিল্পে অসমিয়াদের নিয়ন্ত্রণহীনতা

আসামে খনিজ তেলের মতই চা খাত থেকে আয়ে স্থানীয় নিয়ন্ত্রণ সামান্যই। আবার যাদের শ্রমে এই শিল্পের বিকাশ, তাদের জীবনও আদিম চরিত্রের এক দারিদ্র্যচক্রে আটকে আছে। আসামের এই চা শিল্পের মালিকানা আসামের বাইরের মানুষদের হাতে।

কোম্পানিগুলোর কোন কোনটি ভারতীয়দের–কোনটি আবার বিদেশি। অধিকাংশ কোম্পানি আসামে তাদের কেন্দ্রীয় অফিসও রাখেনি। এসব কোম্পানি এবং তাদের হিসাব কার্যক্রমে আসাম সরকারের সামান্যই নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। ফলে চা খাত থেকে সৃষ্ট মুনাফায় আসামের ভাগ নিয়ে স্থানীয় রাজনৈতিক পরিসরে হতাশা রয়েছে। বলা হয়, 'কেবল আসামের চা খাতে যে মুনাফা হয় তা এই রাজ্যের রাজস্ব আয়ের চেয়ে বেশি। কিন্তু আসাম সেই মুনাফার কথা জানতেও পারে না; কারণ বাগান মালিকরা মুনাফার প্রকৃত চিত্র প্রকাশ করে না। এমনকি হিসাবপত্রে অনেক বাগান লোকসানি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দেখায় নিজেদের।'[১৬] টাটা-বিড়লার মত বৃহৎ ভারতীয় কর্পোরেটদের কোন প্রতিষ্ঠান লোকসান দেয় এটা প্রায় অবিশ্বাস্য। ভারতের অন্যতম বড় চা ব্র্যান্ড হল টাটা টি, যাদের বাগানসংখ্যা অন্তত ৫৩টি। আর বিড়লাদের রয়েছে আসামসহ

দেশের বিভিন্ন স্থানে অন্তত ২২টি বড় বাগান। এইরূপ বড় বড় কর্পোরেট যেখানে ব্যবসা করছে, সেখানে চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি এখনও দুই ডলারের নিচে।[১৭]

চা শিল্প, সামরিকায়ন ও কর্পোরেট স্বার্থ

বিভিন্ন সময় উলফাসহ বিভিন্ন স্বাধীনতাকামী সংগঠনের হাতে চা কোম্পানিগুলোর কর্মকর্তারা অপহৃত হয়েছেন। তাদের চাঁদাও দিতে হত। এরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলায় এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালে সরকার কেবল চা খাতের জন্য এটিপিএসপি (আসাম টি প্লান্টেশন সিকিউরিটি ফোর্স) নামে একটি সশস্ত্র ফোর্স গড়ে তোলে। বাগান মালিক কোম্পানিগুলোই এই ফোর্সের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র ক্রয়ের ব্যয়ভার বহন করছে এবং বেতন-ভাতা দিয়ে যাচ্ছে। এই ফোর্সের ব্যয় নির্বাহের জন্য আসামের চায়ে প্রতি কেজিতে এক রুপি মূল্য বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ প্রায় ৯০টি বাগানে এইরূপ ২ হাজার ৫০০ ফোর্স মোতায়েন রয়েছে। বাগানগুলোতে এইরূপ সামরিকায়ন সেখানকার পরিস্থিতিকে আরও বেশি গোপন করতে সহায়তা করেছে।

আসামে চা জনগোষ্ঠীকে 'ট্রাইবাল'দের জন্য রক্ষিত প্রশাসনিক মর্যাদাও দেয়া হয়নি। এমন বাগান কমই আছে, যেখানে হাই স্কুল রয়েছে। এ ছাড়া বাগানের লেবার লাইনে থাকলেও কার্যত এরা ভূমিহীন। বাগানকেন্দ্রিক দারিদ্র্যের পাশাপাশি এরা সরকারি চাকরি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোটা সুবিধা থেকেও বঞ্চিত। সেই বঞ্চনা কাটাতেই শ্রমিক সমাজ শিডিউল ট্রাইবের মর্যাদা চাইছে।

যেহেতু জনসংখ্যায় বিপুল, সে কারণে আসামের অন্তত এক-তৃতীয়াংশ নির্বাচনী এলাকায় চা শ্রমিকরা ভোটে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শ্রমিক অঞ্চলগুলোতে ভোটারসংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ। আসামের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এরূপ অভিমত রয়েছে যে বিধানসভার ১২৬টি আসনের অন্তত ৩৫টিতে (লোকসভার ১৪টি আসনের ৩-৪টিতে[১৮]) ভোটের হিস্যায় 'কুলি'রা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে দরকারি। এসব কারণেই ভোট এলেই বাগানে বাগানে শ্রমিকদের উন্নয়নের অনেক প্রতিশ্রুতি শোনানো হয়। তবে যুগের পর যুগ কার্যত তার সামান্যই বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন বাগিচা শ্রমিকরা মজুরি চাইছে দৈনিক ৩৫০ রুপি। কিন্তু পাচ্ছে এই লেখার সময় (জানুয়ারি ২০১৯) ১৬৭ রুপি করে। অথচ কেরালায় চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ রুপি। আসামে অদক্ষ কৃষি শ্রমিকদের নির্ধারিত মজুরিও দৈনিক ২৫০ রুপি। ২০১৮-এর জুলাইয়ে ভারতের লেবার কমিশন চা শ্রমিকদের মজুরি ৩৫১ রুপি সুপারিশ করেছিল। কিন্তু কার্যত তার বাস্তবায়ন হয়নি।[১৯] কারণ বাগান মালিকরা শক্তিশালী এক জনগোষ্ঠী। ভোটের সময় শ্রমিকদের খুশি করতে বাগানগুলোতে ব্যাপক পরিমাণে মদ সরবরাহ করা হয় বিনা মূল্যে। কেবল এই অস্ত্র ব্যবহার করেও অনেক নির্বাচনে চা শ্রমিকদের ভোট নিয়ে নেয়া হয়েছে।

আসামের এই শ্রমিকরা (স্থানীয় দরিদ্র মুসলমানদের মতই) অতীতে কংগ্রেসের ভোটব্যাংক হিসেবে পরিচিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে তাতে পরিবর্তন ঘটছে। কারণ এই শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য কিছু করেনি। ২০১৪ ও ২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেসকে হটিয়ে বিজেপি এসব এলাকায় অধিক আসন জিতেছে। সেটাও মূলত তাদের অবস্থার উন্নয়নের বিনিময়ে যতটা, তার চেয়ে বেশি হল হিন্দুত্ববাদের রাজনীতি।

'ট্রাইবাল' হিসেবে প্রশাসনিক স্বীকৃতি না থাকা এবং মজুরি বঞ্চনার পাশাপাশি আসামের চা শ্রমিকদের একটি বড় সমস্যা বোড়োসহ অসমিয়াদের তরফ থেকে সশস্ত্র আক্রমণ। এসব জনগোষ্ঠী নিজেদের সংখ্যাগত আধিপত্য বজায় রাখতে প্রায়ই চা জনগোষ্ঠীর ওপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে আক্রমণাত্মক ভূমিকায় রয়েছে ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বোড়োল্যান্ড। এরূপ পরিস্থিতির কারণে চা শ্রমিক জনগোষ্ঠীর মাঝে প্রচুর অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু তৈরি হয়েছে। বোড়োদের হাতে আসামে অপর নিগৃহীত জনগোষ্ঠী হল আপার আসামের মুসলমান চাষিরা। কিন্তু বোড়োরা বর্তমানে বিজেপির রাজনৈতিক মিত্র। বিজেপি চাইছে বোড়ো বনাম মুসলমান এবং বোড়ো বনাম চা ট্রাইব দ্বন্দ্বগুলো চলতে থাক। এর ফলে আসামজুড়ে জাতীয় চেতনার বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

> অবহেলা ভরে 'কুলি' নামে উচ্চারিত এই শ্রমিক জনগোষ্ঠী আসামের জনসংখ্যার প্রায় ১৫-১৬ শতাংশ। এরা মূলত ছত্তিশগড়, বিহার, ওড়িশা ইত্যাদি অঞ্চল থেকে আনীত মুন্ডা, সানতাল, কুরুক ইত্যাদি ট্রাইবাল জনগোষ্ঠীর মানুষ। আপার আসামের গোলাঘাট, জোরহাট, শিবসাগর, ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, লক্ষ্মীপুর ও দেমাজিতে বাগানগুলো অবস্থিত। শোনিতপুর ও কাছাড়েও কিছু চা শ্রমিক পরিবার আছে। এই চা শ্রমিকদের মাঝে ছোট-বড় ৯০টি নৃ-গোষ্ঠীর সন্ধান পাওয়া যায়।

আসামের অর্থনীতি ও বাংলাদেশের অর্থনীতির তুলনামূলক চিত্র কি বড় আকারে অভিবাসনের ধারণা সমর্থন করে?

ওপরের আলোচনায় আসামের অর্থনীতি এবং সেই অর্থনীতির অসাম্যের রূপটি সংক্ষেপে দেখেছি আমরা। সেই পটভূমিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, সেখানকার অর্থনীতিতে যেরূপ অসাম্য ও শ্রেণিবঞ্চনা বিদ্যমান, তাতে নতুন করে দক্ষিণ এশিয়ার অন্য অঞ্চল থেকে সেখানে দরিদ্র মানুষ কেন যাবে? সেই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর খোঁজার পূর্বে ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের এ সংক্রান্ত স্ববিরোধিতাটিও লক্ষণীয়।

বর্তমান বিশ্বে আনুষ্ঠানিক হিসাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (প্রবাসী ভারতীয় এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত) প্রায় সোয়া তিন কোটি ভারতীয় বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে আছে। অনানুষ্ঠানিক হিসাবে অঙ্কটা আরও বড়। ভারত তার উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতিবছর ৯ জানুয়ারি 'প্রবাসী ভারতীয় দিবস' পালন করে থাকে। এই উৎস থেকে তাদের দেশে বছরে প্রায় ৭০ বিলিয়ন ডলার আসে। অভিবাসী জনসংখ্যার বিশ্ব হিসাবে ভারতের নাগরিকরা প্রথম স্থানে রয়েছে।[২০] কেবল আরব আমিরাতের সঙ্গে ভারতের সপ্তাহে ১০৬৫টি ফ্লাইটের রেকর্ড আছে। ২০১৫ সালে আরব আমিরাতে প্রায় ৩৫ লাখ ভারতীয় অবস্থান করছিল। দেশটির জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশই এখন ভারতীয়রা। মরিশাস, ফিজি, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো, গায়ানা, সুরিনাম প্রভৃতি দেশেও জনসংখ্যার বড় এক হিস্যা ভারতীয়রা। যুক্তরাষ্ট্রেও অন্য দেশীয়দের মধ্যে মেক্সিকোর পরই ভারতীয়দের অবস্থান। বহুদিন থেকেই বিশ্ব অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ বৈধ-অবৈধ অভিবাসন। ভারতীয়রা এর বড় এক সুবিধাভোগী। কিন্তু নিজ দেশে অভিবাসনবিরোধিতা তাদের বড় এক রাজনৈতিক পণ্য। আরও সরাসরি বললে, আসামে কথিত বাংলাদেশিদের নিয়ে রাজনীতি

ভারতের ভোটের রাজনীতিতে সোনার হাঁসের মত ফল দিচ্ছে।

এটা সকলেরই জানা যে একটি জনপদ থেকে অপর জনপদে অনুপ্রবেশের মূলে যদিও কাজ করে উন্নত জীবনের হাতছানি, কিন্তু অর্থনীতিই এ ক্ষেত্রে একমাত্র শর্ত থাকে না। বরং বহু ধরনের আর্থ-সামাজিক কারণ কাজ করে অভিবাসনে। যেমন–জাতি, বর্ণ বা ধর্মগত আক্রান্ত অবস্থা বা অন্য কোন সহিংস পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে অনেক সময় মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পাড়ি জমায়। পরিবেশগত কোন সংকটে বাস্তুহারা হয়ে, সন্তানদের জন্য উন্নত ভবিষ্যতের সন্ধানে কিংবা উন্নত শিক্ষা পরিবেশের লক্ষ্যেও মানুষ এক দেশ থেকে আরেক দেশে পাড়ি জমায়। প্রশ্ন ওঠে, বাংলাদেশ থেকে আসামে পাড়ি জমানোর ক্ষেত্রে এরূপ কোন কারণ কি প্রাসঙ্গিক? বিগত দশকগুলোতে আসাম ও উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশের চেয়ে বহুগুণ বেশি সহিংস পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল। পরিবেশগত ক্ষেত্রেও আসাম বাংলাদেশের চেয়ে নাজুক জনপদ। এ ক্ষেত্রে সর্বশেষ আসাম ও বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অবস্থাটি তুলনা করব আমরা।

সাধারণভাবে জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ ভারতের চেয়ে সামান্য পিছিয়ে থাকলেও আসামের চেয়ে তার অবস্থান এগিয়ে। ২০১৮ সালে প্রকাশিত মানব উন্নয়ন সূচকে ১৮৯ দেশের মধ্যে ভারতের অবস্থান ছিল ১৩০ এবং বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৬। তবে আসামের সঙ্গে তুলনা করলে মানব উন্নয়নের অধিকাংশ মৌলিক সূচকে (এইচডিআই) বাংলাদেশের অবস্থা অনেক ভাল। এইচডিআইয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের মধ্যে আসামের অবস্থান ৩০তম। এই সূচকে আসামের অর্জন দশমিক ৬০৫ এবং বাংলাদেশের অবস্থান দশমিক ৬০৮।

মাতৃমৃত্যুর হার আসামে বাংলাদেশের চেয়ে দ্বিগুণ–লাখে ৩২৮। নবজাতকের মৃত্যুতেও প্রায় অনুরূপ চিত্র। বাংলাদেশের চেয়ে আসামে তা প্রায় দ্বিগুণ। সেখানে বেঁচে থাকার গড় সর্বোচ্চ বয়স ৬২ বছর। বাংলাদেশে তা ৭২। বাংলাদেশে মাথাপিছু আয় প্রায় ১ হাজার ৭০০ ডলার, আসামে এখনও তা এক হাজার ডলারের নিচে। এই লেখা তৈরির সময়ও আসামে প্রায় ৩২ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে পড়ে ছিল। গড় ভারতীয় হারের চেয়ে সেটা প্রায় ১০ শতাংশ বেশি। আসামে এখনও এক-তৃতীয়াংশ মানুষই দরিদ্র।[২১] এর মধ্যে আবার মুসলমানপ্রধান এলাকাগুলো অধিক দরিদ্র। অন্যদিকে বাংলাদেশে ২০১৮-র হিসাবে দারিদ্র্যের হার প্রায় ২২ শতাংশ।[২২]

বাংলাদেশে যে হারে দারিদ্র্য কমছে, আসামে কমছে তার চেয়ে অনেক কম হারে। ভারতে ২০১৮ সালে প্রথমবারের মত নীতি কমিশনের (NITI Aayog) সর্বভারতীয় যে উন্নয়ন প্রতিবেদন প্রকাশিত হল তাতে দেখা যায়, যে তিনটি প্রদেশ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সবচেয়ে পিছিয়ে তাতে রয়েছে আসাম (অন্য দুটি হল বিহার ও উত্তর প্রদেশ)।[২৩] এসব তথ্য-উপাত্ত কোনভাবেই প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ থেকে দলে দলে মানুষের কাজের সন্ধানে আসামে যাওয়াকে সমর্থন করে না।

পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনে আসামের অধিক ঝুঁকিপূর্ণ বাস্তবতাও অভিবাসনে আগ্রহীদের জন্য তা মোটেই আগ্রহোদ্দীপক স্থান নয়। আসামে রয়েছে অধিক বৃষ্টি ও বন্যার প্রাদুর্ভাব। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আসাম যে অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করেছে তাতে দেখা যায়, গত ৬০ বছরে এখানে গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ০.৫৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ২০৫০ নাগাদ এটা ১.৭ থেকে ২.২ ডিগ্রি পর্যন্ত বাড়তে পারে। একই সময়ে বৃষ্টিপাত বাড়তে পারে বর্তমান অবস্থা থেকে ৩৮ শতাংশ বেশি।[২৪] স্বাভাবিকভাবেই এ রকম একটা স্থান দরিদ্রদের বাড়তি আয়ের জন্য প্রলুব্ধ করে না। ফলে কেবল নিকট অতীতেই নয়–আগামীতেও আসামে বাংলাদেশ থেকে অভিবাসনের কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ দেখা যায় না।

তার পরও কয়েক দশকের 'বাংলাদেশি খেদাও' আন্দোলনকে ন্যায্যতা দিতে আসামে ইতোমধ্যে নাগরিকপঞ্জি তৈরির নামে প্রায় ৪০ লাখ মানুষকে 'বিদেশি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর আসামে 'বিদেশি' মাত্রই ধরে নেয়া হয় তারা 'বাংলাদেশি'।

আসাম পরিস্থিতি আরাকান পরিস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে

আসামের এই পরিস্থিতি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারসমূহের দীর্ঘ কয়েক দশকের কর্মকৌশলের 'সফলতা' এবং 'ফল'–উভয়ই। ওপরের আলোচনায় ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি, মূলত আসামের সম্পদ ব্যবহার ও লুণ্ঠন নির্বিঘ্ন করতেই সেখানে অবৈধ অভিবাসনের ইস্যুটি তৈরি করা হয়েছিল ধীরে ধীরে। আবার এই কৌশলকে সঠিক প্রমাণ করতেই সেখানে লাখ লাখ মানুষের নাগরিকত্বের জন্য 'প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নেই' বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। কিন্তু ভারতে কোন বাসিন্দার কাছে 'নাগরিকত্বের প্রমাণপত্র' না থাকলেই কেন ধরে নিতে হবে তারা 'বাংলাদেশি'–এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না ভারতীয় প্রচার সাম্রাজ্যে।

আসামের বর্তমান অমানবিক পরিস্থিতি বাংলাদেশকে অনিবার্যভাবেই আরাকানের পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। সেখানেও রোহিঙ্গাদের বিতাড়নের পূর্বে তাদের নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বর্ণবাদী প্রক্রিয়ায়। সেই বিতাড়ন প্রক্রিয়ার অর্থনৈতিক দিকটিতে দেশি-বিদেশি অনেকের যুক্ততাই বিশ্ববাসী দেখেছে পরে। আসামের ঘটনাবলির পেছনকার ঐতিহাসিক অর্থনৈতিক পটভূমিটিও ওপরে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। আরাকানের বিপর্যয়কর অভিজ্ঞতার আলোকে স্বভাবত আসামের পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক মহলের জরুরি সুদৃষ্টি দাবি করছে।

আলতাফ পারভেজ : দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাস গবেষক
ই-মেইল : altafparvez@yahoo.com

তথ্যসূত্র

১) GDP-Population-Area relationship of Indian States, statisticstimes.com, 20 March 2015

২) Assam's low per capita income is a concern: Finmin, Business Standard, April 24, 2018, https://bit.ly/2LSKLub

৩) ভারতে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কে আসামের মত প্রান্তিক অঞ্চলের রাজনৈতিক প্রান্তিকতা নানাভাবেই নজরে পড়ে। যেমন–এ পর্যন্ত ভারতে যতজন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই উত্তর ভারতীয়। ১৪ জন প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে কেবল উত্তর প্রদেশ থেকেই হয়েছেন আটজন। আসামের মত রাজ্য থেকে একজনও নয়। মনমোহন সিংকে প্রধানমন্ত্রী করার স্বার্থে তাঁকে আসাম থেকে রাজ্যসভার সদস্য করা হয়েছিল–যদিও শিখ ধর্মাবলম্বী মনমোহন সিং কার্যত পাঞ্জাবের সন্তান।

৪) এটা বিশেষভাবে ধরা পড়ে স্থানীয় সরকারের হাতে ব্যয় করার মত অর্থের হিস্যা কমে যাওয়ার তথ্য থেকে। ফেডারেল রাষ্ট্র ভারতে সরকারি ব্যয়ের মাত্র ৫.১ শতাংশ খরচ হয় স্থানীয় সরকারসমূহের মাধ্যমে এবং এই হিস্যা ক্রমে কমছে। ২০০০ সালের পূর্বে এটা ৬.৪ শতাংশের ওপরে ছিল।

দেখুন : Pravakar Sahoo AND Amrita Sarkar, Changing Dynamics of Centre-State Financial Relations, www.insightsonindia.com, YOJANA, June 2013, P.4.

৫) এমনকি 'প্ল্যানিং কমিশন' ভেঙে ভারত 'নীতি আয়োগ' নামে যে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কাঠামো গড়ে তুলতে চলেছে নরেন্দ্র মোদি সরকার–সেখানেও তার চেয়ারম্যান হলেন প্রধানমন্ত্রী। তবে তাতে গভর্নিং বডিতে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের রাখা হয়েছে।

৬) তেল ও চা অর্থনীতির তুলনায় কৃষির অবদান তৃতীয় কোন পক্ষ কর্তৃক লুণ্ঠিত হয়েছে কমই। কিন্তু কৃষির অবদানে যাদের বড় এক ভূমিকা ছিল সেই মুসলমান চাষিদের শেষ পর্যন্ত অসমিয়া জাতীয়তাবাদ প্রতিপক্ষ ('অবৈধ অভিবাস'!) হিসেবে আবিষ্কার করে। তাদের এই শত্রুচেতনায় তেল ও চা খাতের প্রকৃত লাভবানরা ভীষণভাবে উপকৃত হয়।

৭) Economic Characteristics of Assam ,https://bit.ly/2KGrAmq

৮) M. Govinda Rao, Central transfers to states in India: Rewarding performance while ensuring equity (Final Report of a Study Submitted to NITI Aayog), National Institute of Public Finance and Policy, New Delhi, p.11. https://bit.ly/2HtBJyb

৯) Ibid.

১০) Chauvinism and Economic Exploitation behind the Attack on Citizenship Rights of 40 lakh Working People in Assam, New Trade Union Initiative, August 1, 2018, https://bit.ly/2KKETCy

১১) The Hindu, 14 Nov. 2019, India.

১২) আসামের কংগ্রেস নেতা অমিয় কুমার দাসের এক বক্তব্য থেকে দেখা যায়, তেল ও চায়ের শুল্ক, কর ইত্যাদি বাবদ আয়ে আসাম পেত মাত্র ৪ শতাংশের মত। Ditee Moni Baruah, The Refunery Movement in Assam, EPW, January 2011, p. 65.

১৩) Pankaj Sarma, 32% below poverty line, https://bit.ly/2Gq8nBs

১৪) ১৯০০ সালের মধ্যেই আসামে ব্রহ্মপুত্র ও সুরমা উপত্যকার সবচেয়ে ভাল জমিগুলো চা বাগানের নামে 'বরাদ্দ' হয়ে যায়। এই বরাদ্দের যেহেতু বিশেষ শ্রেণি চরিত্র রয়েছে, তাই সাধারণ ভূমিহীন মুসলমান চাষিদের চরের জমি বরাদ্দ যেভাবে অসমিয়া বুদ্ধিজীবী শ্রেণিকে প্রতিবাদে মুখর করেছে, চা বাগান মালিকদের বিষয় সেভাবে করেনি। এখনও এ বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে কমই।

১৫) Ritupan Goswami, Rivers and History: Brahmaputra vally in the last two centuries, Phd thesis, JNU, 2010, chapter-III, p. 172. https://bit.ly/2INTGLN.

১৬) Julee Dutta, Centre-Assam Financial Relations: A Critical Analysis, www.iosrjournals.org, p.48.

১৭) Tea workers demand hike in minimum wages in India, Peoples Dispatch, March 05, 2019, India.

১৮) ডিব্রুগড়, জোরহাট ও তেজপুর লোকসভা নির্বাচনী এলাকা।

১৯) Assam tea workers seek parity with those elsewhere, Businessline, November 15, 2018, https://bit.ly/2L2wiv4

২০) Firstpost, Dec 15, 2017, https://bit.ly/2UsZlXW

২১) টেলিগ্রাফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী যা প্রায় এক কোটি দেড় লাখ। Pankaj Sarma, 32% below poverty line পূর্বোক্ত।

২২) Poverty line needs to be redefined: experts, The Daily star, October 25, 2018,https://bit.ly/2UiKCil

২৩) NITI Aayog, SDG India Index, Baseline report 2018. https://bit.ly/2GDHjit

২৪) Assam State Action Plan on Climate Change (2015 - 2020). Report. Assam: Department of Environment and Forest, Government of Assam, India, September 2015. 1-127.

গ্যাসের মূল্যহার
(টাকা/ঘনমিটার)

গ্রাহকশ্রেণী	আগের ট্যারিফ	নতুন ট্যারিফ	বৃদ্ধি (%)
বিদ্যুৎ	৩.১৬	৪.৪৫	৪১
সার	২.৭১	৪.৪৫	৬৪
শিল্প	৭.৭৬	১০.৭০	৩৮
চা-বাগান	৭.৪২	১০.৭০	৪৪
ক্যাপটিভ পাওয়ার	৯.৬২	১৩.৮৫	৪৪
বাণিজ্যিক			
ক) হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট	১৭.০৪	২৩.০০	৩৫
খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প	১৭.০৪	১৭.০৪	০
সিএনজি ফিড গ্যাস	৪০.০০	৪৩.০০	৭.৫
গৃহস্থালি			
ক) মিটার	৯.১০	১২.৬০	৩৮
খ) সিঙ্গেল বার্নার	৭৫০.০০	৯২৫.০০	২৩
গ) ডাবল বার্নার	৮০০.০০	৯৭৫.০০	২২

সূত্র : বণিক বার্তা, ১ জুলাই ২০১৯